সব চরিত্র বাস্তবিক

দীপ্তাংশু সেনগুপ্ত

ফিল্ম-টিল্ম নিয়ে আমি বখেছি বহু আগে। খুব ছোটবেলায় যদিও সিনেমা জিনিসটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল না। কৌতূহলের শুরু বোধ হয় সেই কারণেই। টিভিতে রোববার বিকেলে 'বই' হত। আমি দেখতে পেতাম না। সকলের ত্রাস ছিল চোখ খারাপ হয়ে যাবে। ফলত ঃ সে আধরা রহস্যদুনিয়া নিয়ে আমার উৎসাহ ছিল সীমাহীন।

অথচ জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার আগেই আমি হল-এ গিয়ে দু-দুটি ছবি দেখে ফেলি। একটাতে গানের দৃশ্যে নায়িকার শাড়ির রং চকিতে পাল্টাচ্ছে দেখে বড় পুলক হয়, আর অন্যটায় লরেলকে হার্ডি রেগেমেগে সাবানজলের গামলায় চুবাচ্ছে দেখে বড্ড হাসি। তারপর বড় হতে হতে নানা ঘাটের জল চেখে চেখে দেখেছি। তবে কলেজে ওঠার আগে পর্যন্ত সিনেমা দেখাটা মোটের ওপর ছিল একক ফুর্তি।

কলেজে উঠে আরও গুটিকয়েক সিনেমাখোর বন্ধু জুটল। মহোৎসাহে দেখতে গেলাম চলচ্চিত্র মোচ্ছব। সেই প্রথম বাঙালের হাইকোর্ট দর্শন। ওখানে গিয়ে দেখি ওরে পাগল...সিনেমা কি তোর একার! সাহেব, কবি, আঁতেল, গীটারবাজ, নায়িকা, গে, আপিসফেরতা, ফিল্মস্টাডিজ, পাতাখোর, ডেলিগেট, টেকোবুড়ো, ঝোলাব্যাগ মিলেমিশে সে এক পাগলে মাতালে হট্টগোল। আমরাই তা ক্যাবলা থাকি কেন। ভিড়ে পড়লুম দে দোল দোল বলে সবার রঙে রঙ মেশাতে।

চাদ্দিকে চেয়ে দেখি সিরিয়াস মুখ সব। কীসব বই - খাতা - পেনসিল বাগিয়ে খস্‌খস্‌ ছক কষছে, সকালে রবীন্দ্রসদন তারপর পরপর নন্দনে দুটো দেখে সোজা নিউ এম্পায়ারে ইতালিটা মেরে...না না ওতে স্টার -এ কার্লোস সরা-টা মিস্‌ হয়ে যাবে...তালে বরং সকালটা সদনে দেখে দুপুরটা নন্দনে সেরে নিউ এম্পায়ারে ভেনিজুয়েলাটা ঘুরে সন্ধ্যায় সদনে ফের ইরান ...ওহ্‌, তাতেও সরা মিস...। আমাদের তো ইদিকে একগাল মাছি। চারিদিকে সবাই ধরাকে সরা কচ্ছে আর আমাদের কাগজও নেই পেনসিলও নেই। কোথায় বা কী দেখব কী চলছে কিছু তাল পাচ্ছি না।

এক পরিচিত ছোকরাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিগালাম ''কিরে? কি কি দেখলি?'' বিড়িতে সূক্ষ্ম টান দিয়ে সে 'নিউ এম্পায়ারে দুটো কিস্‌লোওস্কি মেরে এলাম...এখন নন্দনে আরও দুটো মারব'' বলে খুনি মেজাজে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। লোকজন পটাপট চুটকিতে কিস্‌লোওস্কি মারছে দেখে তো আমাদের মুখে রা সরে না। দলের এক প্রাজ্ঞ বন্ধু তখনও মত দিলে, এ বিশ্বের হাটে ভারতীয় সিনেমা দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করা উচিৎ। মনরত্নম -এর 'ইরুভার'। মিনিট হিসেবে করে দেখা গেল ফিরে গিয়ে দিনের শেষে প্র্যাক্টিকাল ক্লাসটাও করতে পারব। চলো, লেটস্‌ গো। ঢুকে পড়লাম 'ভারতীয় ছবি' দেখতে।

সিনেমাটি ভয়াবহ রকমের ভারতীয় ছিল। আদ্যন্ত নাচাগানা, ঐশ্বর্য্য কখনও ঝরণার জলে কভু বা এয়ারপোর্ট-এ। সে তুমুল ডান্সতরঙ্গে ভেসে সিনেমা শেষ যখন বেরোলাম দেখি প্র্যাক্টিকাল ক্ল্যাসেরও সময় পেরিয়ে গেছে। লিখিত সময়ের চেয়ে অন্ততঃ সোওয়া এক ঘন্টা বেশি সময় ধরে চলছে সিনেমাটি। হয়তো বিদেশে পাঠানো হয়েছিল গানটানগুলো বাদ দিয়ে। সেখান থেকে মেপে আসা সময়টাই লেখা ছিল তালিকায়। সেই আমার প্রথম ও শেষ 'ভারতীয় ছবি' দেখা ফেস্টিভাল-এ।

কিন্তু ভারতীয় ছবি দেখা বন্ধ করলেও ফেস্টিভালে খারাপ ছবি দেখা বন্ধ হয়নি কোনদিনই। অচিরেই বুঝেছি ভাল ছবির মতো খারাপ ছবিরও কোন জাত নেই, দেশ-কালের গন্ডিতে তাকে বেঁধে রাখা যায় না। বস্তুত হিসাব করলে দেখা যাবে, যত না ভাল ছবি দেখেছি, খারাপ ছবি দেখেছি তার চে' ঢের বেশি। কিন্তু ফেস্টিভালে খারাপ ছবি দেখার মস্ত ফ্যাচাং অন্যত্র বর্তমান। সকল রদ্দিতেই বুদ্ধিবৃত্তির স্টিকার লাগানো। আপামর বলিউড দেখে বেরিয়ে সহজেই পরমবৃদ্ধ সেজে বলা যায় ''অ্যাঃ জঘইন্য!'', কিন্তু ফেস্টিভালে আরও হিপোক্রিট ফ্রেঞ্চ ছবি দেখে বেরিয়ে এ বীরত্ব দেখানো কঠিন। নেদারল্যান্ডের 'নো ট্রেনস্‌, নো প্লেনস্‌' দেখে আঁতিপাতি লোক খুঁজছি কার কাছে এ নিয়ে চাট্টি কুৎসা করে মন হাল্কা করব। সামনে দেখি দাড়িওয়ালা বয়োজ্যেষ্ঠ ফিল্মবোদ্ধা। মুখ খোলার আগেই একগাল হেসে বললেন ''ওমাঞ তুইও এসেছিস...বা! বা!...একটা অপূর্ব ছবি দেখলাম এইমাত্র— ''নো ট্রেনস্‌, নো প্লেনস্‌'।'' নিজেক ঢোঁক নিজেই গিলছি তখন। মুখে কাষ্ঠ হাসি। মনে মনে গাল পাড়ছি বয়োজ্যেষ্ঠকে। বাজে ছবি দেখার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়েছে। সাধে কি শাস্ত্রে আছে অমোঘবাক্য 'নো ব্রেন, নো পেনই'।

তবে এজন্যেই বোধহয় ভালখারাপ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় তর্কে না গিয়ে যে কোন সিনেমা সম্পর্কেই আশ্চর্য মত পোষণ করত নন্দনচত্বরে ঘুরে বেড়ানো এক পাগল। সিনেমা দেখে বেরিয়েই সে ঘোষণা করত ''হুঁঃ। 'বগ্‌রা' ছবি!'' ঘনাদার মতো ঠিকরানো নাক কুঁচকে তার অননুকরণীয় ''ব-অ-গ্‌-রা'' বলাতেই ঝরে পড়ত যাবতীয় হতাশা ও খারাপ লাগা। খ্যাতিমানকে পুজো করার কোন দায় তার ছিল না। খারাপকে খারাপ বলতে জানত। 'রিভার' দেখে বেরিয়ে নাক কুঁচকে ছাড়ত 'হুঁ! রেনোয়া!! ব-অ-গ্‌-রা ছবি বানায় সালা।'' সেই থেকে ধারণা হয়েছিল 'বগরা ছবি' মানে খুব নিকৃষ্ট মানের কিছু হবে বা। 'এইট এণ্ড হাফ' দেখে বেরিয়ে চোখে মুখে ভাল লাগা উপচাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ''কী? কেমন লাগল?'' অমায়িক পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল ''ওঃ হেবি বগ্‌রা ছবি বানিয়েছে কিন্তু মাইরি...!'' বুজলাম 'বগ্‌রা' শব্দটাকে সে নিজের মতো গড়ে পিটে নিয়েছে।

'এইট এণ্ড হাফ' -এর কথায় দেবেশের কথা বলতেই হয়। সে তখন কলকাতারই কোন এক স্বল্পখ্যাত চলচ্চিত্র শিক্ষাকেন্দ্রে 'সিনেমাটোগ্রাফি' শিখতে ব্যস্ত। সেখানে তাদের চলচ্চিত্রে আলোর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হচ্ছে তখন। দেবু তাতে সিনেমার আলোর উপস্থিতি এমন সচেতন হয়ে পড়ল যে এক বাকি অন্য সবকটি দিক নিয়ে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গেল। পর্দার চলমান কিছু দেখলেই সে রোম খাড়া করে শুধু আলোর ব্যবহার দেখতে থাকে। আমাদের গ্রুপ -এরই জনৈক তিলেফক্কর একবার তাকে বাড়িতে ডেকে পর্নোগ্রাফি দেখাতে দেবেশ প্রস্তরবৎ পর্দার দিকে চেয়ে থেকে অবশেষে মন্তব্য করেছিল ''গোলা আলো করেছে কিন্তু।'' সেই দেবুকে আমরা একদিন ডেকে এ ঘরোয়া ফিল্ম শো তে 'এইট এণ্ড হাফ' দেখালাম। সিনেমা শেষে বাকরুদ্ধ দেবুকে জিজ্ঞেস করা হল ''কিরে কেমন লাগল'? যথারীতি ক'সেকেন্ড চুপ থেকে দেবুর মন্তব্য 'ছবিটা ভালই...তবে আলো খুব খারাপ।''

দেবেশের ছিল দুর্বোধ্যতার গর্ব। সিনেমার সংস্পর্শে এসে হরেক কিসিমের লোক দেখেছি। কারো কাছে বিশ্বের কোন কিছুই দুর্বোধ্য নয়। তারা সবই বোঝে। বেশ বেশিই বোঝে। বুঝতে পারাতেই তাদের অহঙ্কার। দেবুর ছিল এর উল্টো। বুঝতে না পারতেই

তার আনন্দ। ''চার নম্বর বার ব্রেথলেস দেখলাম...কিছুই বুঝতে পারলাম না...'' এ আক্ষেপ যে তার মুখে কতবার শুনেছি তার ঠিক নেই। ব্রেথলেস চারবার দেখেও যে 'কিছুই' বোঝেনি সে আদৌ 'বোঝা'র ইচ্ছা কতটা পোষণ করে সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ জাগে আমার। এ কথা একদিন বিনীতভাবে দেবুকে জানাতেই সে তো চটে কাঁই। ''হুঁঃ!...সেদিন ক্লাব শোতে দেখলাম...সপ্তমবার। দেখে বেরোচ্ছি...ধীরেনদার সাথে দেখা। বললাম 'দাদা এ নিয়ে সাতবার দেখলাম... কিছুই তো বুঝলাম না'। ধীরেনদা পর্যন্ত বললেন 'কী আর বলব ভাই। আমার এ নিয়ে তেরোবার হল ... এখনও কিছুই...''। এ অমোঘ যুক্তির পর আর কীই বা বলার থাকতে পারে। সত্যজিৎ তাঁর 'বিষয় চলচ্চিত্র'তে ব্রেথলেস -এর চিত্রভাষা বোঝাতে দিয়েছিলেন 'খরচ কমানোর' যুক্তি। এ নিয়ে মানিকবাবুকে বিস্তর গাল দিতে শুনেছি বহু ইন্টেলেকচুয়ালকে— 'সালা বোঝেনি মালটা, ভুলভাল কথা বলেছে'। কালো কালো দেখেছি সিনেমার জগতে এই 'বোঝা' ব্যাপারটা এক অবাক ম্যাজিককাঠি, যা, যে কোনও পকেটেই ঠিকঠাক মাপমত, যার যার মতো করে ঠিক। বিশেষত গোদার হলে তো আর কথাই নেই। কেউ বুঝুক না বুঝুক আজ বসন্ত।

এসব 'কিছু-উ-ই' বুঝতে না পারার অভিনব আখ্যানে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম একবার এক বান্ধবীর কাছে কলেজ ক্যান্টিনে। সে নির্বিকার বললে 'আহা এতে এতো অবাক হওয়ার কী আছে...সাবটাইটেল পড়তে পারে না বেচারারা...।' আমার তাতে মনে পড়ে গেল কলেজেরই এক বিদগ্ধ বন্ধু কদাপি কিঞ্চিৎ ফ্রেঞ্চ শিখেছিল। কিন্তু তাতে সে খুব দড় হয়েছিল এ কথা আমরা গুটিকয়ক নির্বোধ ঠিক বিশ্বাস করতাম না। ফ্রেঞ্চ সিনেমাও তাকে দিব্যি সাবটাইটেল পড়েই দেখতে হয় এমনই ভেবে এসেছি অ্যাদ্দিন। এদিকে আমাদের নির্বুদ্ধিতায় তো ফ্রেঞ্চজ্ঞানী যুগপৎ আহত ও মরিয়া। ফলতঃ একদিন ঘরোয়া আড্ডায় 'ডে ফর নাইট' দেখতে দেখতে সে আশ্চর্য উপায়ে প্রতিবাদ জানালে, সিনেমার মাঝপথে হঠাৎ প্রগাঢ় গাম্ভীর্য, তার দাবী ''ভলিউমটা আগে বাড়িয়ে দে তো। ডায়লগ সব শুনতে পাচ্ছি না।... অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে।''

'ফিলিম' বোঝাবুঝির কথায় সোমেনদার কথা না বলে থাকা যায় না। তাঁরও ছিল 'না বুঝতে পারা'র পরিতৃপ্তি। তবে দেবেশের অনেক উপর দিয়ে যেতেন তিনি।

—নন্দনে সেবার গোদারের রেট্রো চলছে। দেখতে গেলাম 'টু আর থ্রি থিংস আই নো অ্যাবাউট হার'। তেরো মিনিট দেখে বেরিয়ে এলাম হল থেকে।

—ওমা, সেকি! কেন?

—দেখলাম কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সবকিছু না বুঝে হলে বসে থাকা যায়, কিন্তু গোদার যায় না। বেরিয়ে এসে সিগারেট খাচ্ছি... দেখি আরেকজনও বেরিয়ে এসেছেন।

—কে! কে!

—মৃণাল সেন...।

ফিল্ম ফেস্টিভাল -এ যাতায়াত শুরুর বহু আগে থেকেই কুৎসা শুনতাম সেন্সরশিপের দৃষ্টি এড়ানো উত্তেজক ছবি দেখতেই নাকি ওখানে যত ভিড়। কিন্তু আমার তেমন মনে হয়নি কখনও। তবে মখমলবাফ-এর 'সেক্স এন্ড ফিলজফি' তো সেবার নামেই হিট। নিউ এম্পায়ার উপচে পড়ল সন্ধ্যেবেলা। দেখতে এসেও ভিড়ের চোটে ঢুকতেই পারলেন না কত মহা মহা ডেলিগেট। তাদের সৌজন্যে শেষে খবরকাগজ পর্যন্ত গড়াল ক্যাচালটা। এদিকে যারা হলে ঢুকতে পেল তাদেরও অনেকেই হতাশ করলেন মখমল বাফ। শুধুই ফিলসফি আছে, সেক্স নাই। এ ফিলিমে আর কিছু 'ঘটার' নেই বুঝে আমার সামনের সিট থেকে তিনজন হাই টাই তুলে ''চলো হে... এ শুধু নাচগানই হবে এতে'' বলে আড়মোড়া ভেঙে মাঝপথে উঠে চলে গেলেন। সিনেমা শেষের আগেই বেশ কিছু সিট ফাঁকা।

আরও তুমুল ঘটেছিল শিশির মঞ্চে। অন্য কিছুই যুতসই না পেয়ে একদিন সেখানে গেছিলাম শিশুচলচ্চিত্র দেখতে। কচিকাঁচাদের হাত ধরে বাবা-মা'রা এসেছেন। যদ্দুর মনে পড়ে সেটা ছিল 'পোলকে' নামে একটা ডাচ্ ফিল্ম। শিশুদের ফিল্ম হলে কী হবে তাতে চুম্বনদৃশ্য ছিল। তাতে তো বাঙালি গার্জেন মহলে তুমুল উসখুসানি। একসময় আর থাকতে না পেরে শেষে পিছন থেকে কচিকণ্ঠে প্রতিবাদ উঠল। ''বাবা! আবার মা আমার চোখ চেপে ধরে আছে' বলেই ভ্যাঁ -পূর্বক হাপুস কান্না। হলময় গুক্‌গুক্ হাসি।

সিনেমা চলাকালীন দর্শক কথা বললে স্বাভাবিক কারণেই বিরক্ত হয়েছি বহু। কিন্তু কখনও কখনও না হেসেও পারিনি। এমনই হয়েছিল প্রথমবার বড় পর্দায় 'ব্যাটেলশিপ পটেমকিন দেখতে গিয়ে। আইজেনস্টাইনের ভক্ত এক বৃদ্ধ বসলেন আমার তিন রো পিছনে। সে তো চুপ করেই থাকতে পারে না কটি মুহূর্ত। মাঝে মাঝেই আসরে বাঈজি নাচ দেখার মতো ''অহো কী ফ্রেম, আহা কী দৃশ্য' বলে উৎখিয়ে ওঠেন। সকলেরই ব্যাপারটি বিরক্তিকর লাগছে। আশেপাশের কেউ আপত্তি করায় সে বুড়ো উঠল খেপে। তিতিবিরক্ত কাঁপাগলায় 'বেশ করেচিতো বলেচি! ...এ ফিল্মের মর্ম বোজো? এই একটা ফিল্মের জন্য একটা আস্ত লাইব্রেরি করা যেতে পারে তা জান? তাকে থরে থরে শুধু ব্যাটেলশিপ পটেমকিন ব্যাটেলশিপ পটেমকিন ব্যাটেলশিপ পটেকমনি...হলে না হেসে থাকা দায়, বিপ্লবের আঙিনায় তখন তুমুল খেউড়।

এমনই আরেকটি ঘটনা ঘটে সেবার জাভোর রেট্রোস্পেকটিভ-এ কর্নেল রেড্‌ল্' দেখছি রবীন্দ্রসদনে। দেশদৃশ্যে তাকে বলা হয়েছে আত্মহত্যা করতে, সম্মানজনক মৃত্যু সম্ভব তাতেই। বন্ধ করে আত্মহত্যার আগে ছোটাছুটি করছে উন্মাদপ্রায় রেড্‌ল্। আমার পাশের ভদ্রলোকটি যে এ সময় উত্তেজনার তুঙ্গে পৌঁছেঁছেন তা টের পাইনি আগে। তংঅর ধারণা নির্ঘাত এ এক তুলকালাম অ্যাকশান থ্রিলার, চোখধাঁধানো জেমসবণ্ডিয়ানার রেড্‌ল্ শেষমুহূর্তে পালাবে এ ঘর থেকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেই আর থাকতে না পেরে উদ্বেগের চোটে তিনি আমাকে দিলেন এক খোঁচা। আমি অবাক হয়ে চাইতেই দাঁতে নখ কেটে ঝুঁকে পরে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় ''পালাবে কি করে বলুন তো? পালাবে কি করে?? ওঘর থেকে কি করে পালাবে!''

জাভোর রেট্রোর কথায় শুভ্রজিৎদার কথা না বলে থামা যায় না। সে ছিল ধর্মে নকশাল। তখনও চারদিকে এত মাওবাদী রমরমা হয়নি। কিন্তু তথাপি তারা চিরকালই আদ্যন্ত সিপিএম-বিরোধী। ফলে মূলত নির্বিবাদী মানুষ হয়েও তার জীবনের যাবতীয় বিপত্তির জন্য যে আসলে সিপিএম-ই দায়ী এ ধারণায় কোন এক অজ্ঞাত কারণে বদ্ধমূল ছিল সে। তবে পাগল বলে এসব নিয়ে তাকে খুব ঘাঁটাত না কেউ। যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও শুভ্রদা ফেস্টিভাল -এ টিকিট চেকারটিকে ধরে ঝোলাঝুলি শুরু করত তাকে ঢুকতে দিতে হবে বিনা

টিকিটে। এক আবদারে কখনও কখনও যে সাড়া মিলত সেটাই আশ্চর্যের। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে বিফল মনোরথ হলেই শুভ্রদা তেড়ে গাল পাড়ত সিপিএম-কে। বিনাটিকিটে ঢুকতে না দেওয়ার পিছনে সে আসলে তার পলিটিকাল মতপার্থক্যই দায়ী এ নিয়ে কোন সংশয়ই থাকত না তার।

জাভোর রেট্রোতে বেশিরভাগ ছবিই আমরা দেখেছিলাম রবীন্দ্রসদনে সকালের শোতে। ঐ শো-র টিকিট লাগে না। আগের দুপুর থেকে ফ্রি-পাশ দেওয়া হত কাউন্টারে। আমরা সাধারণত আগেরদিন পাশ তোলায় বিশ্বাসী ছিলাম না। শো -এর দিন সকালে একটু আগে এসে ও ওর কাছে চেয়েচিন্তে যোগাড় করতাম। লোকেদের কাছে অতিরিক্ত পাশ পাওয়া যেতই নিশ্চিতভাবে। সুভ্রজিৎদা এসবের ধার ধারত না। সকালের শোতে পৌঁছাতে দেরী হতে পারে বলে প্রতিদিন নিজের পাশ নিজে তুলে নিয়ে যেত।

এমনই একদিন তার আসতে দেরি দেখে আমরা হল -এ ঢুকে গেছি। ও কখন এসেছে, কখন দেখেছে কিছুই জানি না। শো ভাঙলে বাইরে এসে দেখি মুখ লাল করে বসে আছে গুম হয়ে।

—কী গো সিনেমা দেখলে?

—শালা সিপিএম-এর পুলিশ আমাকে মিসগাইড করেছে।

আমরা তো থ। আট্টু জিগেস করে জানা গেল খুব দেরি হয়ে যাওয়ায় শেষমুহূর্তে ছুটতে ছুটতে পাস হাতে শুভ্রজিৎদা পৌঁছান এ চত্ত্বরে। তাড়াহুড়োতেই হবে হয়তো বা, রবীন্দ্রসদনের পাশ নিয়ে সে সোজা ঢুকে পড়ে নন্দনে। পুলিশ আটকালে সে পাস দেখায়। পুসিশ রাস্তা ছেড়ে দেয়। ফলতঃ জাভো না দেখে ভুল সিনেমা দেখে বেরিয়ে এসেছে সে। আমরা বললাম 'এতে আর পুলিশের দোষ কই! ভুল তো তুমিই করেছ।"

—আমার তো সন্দেহ হয়েছিল একবার তখনই। শালা...সিপিএম- এর পুলিশ কি জানে কিছু? জ্ঞানগম্যি আছে নাকি শালাদের? পুলিশটাকে জিজ্ঞেস করলাম 'জাভো'। বলল ''জান''।